ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

সপ্তম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

সপ্তম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সংকলন)

সপ্তম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), পুরাতন ২৭
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-3421-4

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ : বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা *ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, শাহজাদা এম আকরাম ও শাম্মী লায়লা ইসলাম*	৯
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় *মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল*	২০
তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় (এপ্রিল ২০১৫-মার্চ ২০১৬) *মনজুর ই খোদা ও নাজমুল হুদা মিনা*	৩৬
বাংলাদেশে ক্রিকেট : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং পাতানো খেলা *ইফতেখার জামান, রুমানা শারমিন ও মোহাম্মদ নূরে আলম*	৪৩
গবেষক পরিচিতি	৫৪

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ছয়টি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সপ্তম সংকলন প্রকাশিত হলো।

প্রথম প্রবন্ধে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওপর পর্যালোচনা নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান, অর্থ ও মানবসম্পদ, অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতা, দুদকের জবাবদিহি ও তদারকি এবং দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা– এই সাতটি ক্ষেত্রে ৫০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে দুদকের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পরিশেষে প্রতিষ্ঠানটির মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সংকলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা উত্তরণে সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা, প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা এবং প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা এবং এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সবশেষে চতুর্থ প্রবন্ধে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সুশাসন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে বিসিবির সুশাসনকাঠামো এবং পাতানো খেলার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে এসব সমস্যার সমাধানে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

সংকলনটি প্রস্তুতি এবং সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীরা। তাদেরসহ অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন– সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। টিআইবির সব গবেষণার উপদেষ্টা হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের অমূল্য অবদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ, যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা*

ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, শাহজাদা এম আকরাম ও
শাম্মী লায়লা ইসলাম

১. প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও কৌশল প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে সুশাসনের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধকেন্দ্রিক একটি কার্যকর সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান, দুর্নীতিবিরোধী কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ২০১২ সালে 'জাকার্তা নীতি' প্রণীত হয়, যেখানে দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও জবাবদিহির জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। ট্রান্সপা রেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যার মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি যোগাযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও সংলাপের মাধ্যমে করা একটি দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্যোগের অধীনে দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটি বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত মান নির্ধারণী টুল প্রস্তুত করে, যা ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, আগ্রহী এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও বিশেষজ্ঞ দলের অংশগ্রহণে যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালে ভুটানে এই টুল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী সময়ে মতবিনিময় কর্মশালায় প্রস্তাবিত মতামতের ওপর ভিত্তি করে সংশোধিত হয়।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের ওপর তথা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওপর পর্যালোচনা সম্পন্ন করে। এই পর্যালোচনার লক্ষ্য ছিল :

- দুদকের কার্যক্রম ও উন্নয়নের ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা,
- দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক চিহ্নিত করা এবং

* ২০১৬ সালের ৭ আগস্ট ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

- দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২. গবেষণাপদ্ধতি ও গবেষণার সময়

এই গবেষণা পরিচালনায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :

নথি বিশ্লেষণ : দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত আইন ও বিধি, বিদ্যমান সাহিত্য, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা।

নিবিড় সাক্ষাৎকার : দুদকের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান ও কমিশনার, দুদকের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, আইন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিষ্ঠানের (সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান) প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা : সংবাদমাধ্যমকর্মী, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সদস্যদের সঙ্গে দুদকের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা নিয়ে দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (১০ ফেব্রুয়ারি ও ২৩ মার্চ ২০১৬) আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভা : গবেষণার খসড়া ফলাফল উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণের জন্য দুদকের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে ২০১৬ সালের ৩০ জুন একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দুদকের কার্যক্রম মূল্যায়নের এই গবেষণায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ এই তিন বছরের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৫ নভেম্বর থেকে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩. গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক

এই গবেষণায় মোট ৫০টি নির্দেশকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকগুলো সাতটি পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত মূল্যায়নের ক্ষেত্র

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নির্দেশকের সংখ্যা
১. দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান	৭
২. দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ	৯
৩. দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম	৯
৪. দুদকের প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	৯
৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতা	৫
৬. দুদকের জবাবদিহি ও তদারকি	৪
৭. দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা	৭
মোট	৫০

৪. স্কোরিং পদ্ধতি

উপরিউক্ত সাতটি পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত মোট ৫০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশকের জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি নির্দেশককে তিনটি সম্ভাব্য স্কোর– উচ্চ (২), মধ্যম (১) ও নিম্ন (০)[1] দেওয়া হয়েছে। নির্দেশকের মাত্রা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য এই স্কোরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–সার্বিক স্কোর ৬৭ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে হলে 'উচ্চ', সার্বিক স্কোর ৩৪ থেকে ৬৬ শতাংশের মধ্যে হলে 'মধ্যম' এবং সার্বিক স্কোর শূন্য থেকে ৩৩ শতাংশের মধ্যে হলে 'নিম্ন'।

প্রতিটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ওই ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়। এরপর ওই ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ক্ষেত্রের (আইনি ভিত্তি, স্বাধীনতা ও কাজের আওতা) নির্দেশকগুলোর স্কোর হচ্ছে ১১ (চারটি নির্দেশক ২ করে আর তিনটি নির্দেশক ১ করে পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রতিটি নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর হচ্ছে ১১/১৪ X ১০০ = ৭৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

৫. উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই গবেষণার পর্যালোচনা অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের সার্বিক স্কোর ৬১ দশমিক ২২ শতাংশ, যা 'মধ্যম' পর্যায়ের স্কোর। এখানে লক্ষণীয় যে এটি 'উচ্চ' স্কোরের থেকে ৫ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট কম এবং এটি নির্দেশ করে উচ্চপর্যায়ে প্রবেশ করতে

[1] অনুপস্থিত বা অনুল্লেখ্য।

প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া ৫০টি নির্দেশকের মধ্যে ২১টি (৪২ দশমিক ৮৬ শতাংশ) 'উচ্চ', ১৯টি (৩৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ) 'মধ্যম' এবং নয়টি (১৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ) 'নিম্ন' স্কোর করেছে।

চিত্র ১ : গবেষণার ফলাফল : ক্ষেত্র অনুযায়ী দুদকের স্কোর

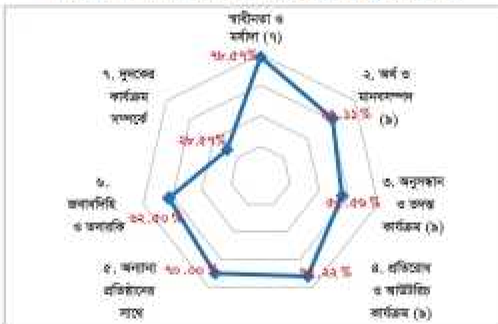

গবেষণার পর্যালোচনা অনুযায়ী দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদা শীর্ষক ক্ষেত্র সর্বোচ্চ স্কোর (৭৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ) করেছে, যার মধ্যে চারটি নির্দেশক উচ্চ এবং তিনটি নির্দেশক মধ্যম স্কোর পেয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর (৭২ দশমিক ২২ শতাংশ) পেয়েছে দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদবিষয়ক ক্ষেত্র, যার মধ্যে পাঁচটি নির্দেশক উচ্চ, তিনটি মধ্যম ও একটি নিম্ন স্কোর পেয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতা (৭০ শতাংশ) এই মূল্যায়নের অপর একটি মাত্রা যা উচ্চ ভাগে পড়েছে। দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ (৬১ দশমিক ১১ শতাংশ) এবং জবাবদিহি ও সার্বিক তদারকি (৬২ দশমিক ৫ শতাংশ) এ দুটি ক্ষেত্র সার্বিক স্কোরের থেকে সামান্য বেশি স্কোর পেয়েছে। এটিও নির্দেশ করে যে, সম্পদ বণ্টন ও সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে হবে। দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (৫৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ) সার্বিক স্কোর থেকে কম পেয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ, দুর্নীতির অভিযোগকারীর অভিগম্যতা, কম শাস্তির হার এবং দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহে জেন্ডার চিহ্নিত না করার বিষয়গুলোতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা—এই ক্ষেত্রটি সবচেয়ে কম স্কোর (২৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ) পেয়েছে, যেখানে মোট সাতটি নির্দেশকের মধ্যে চারটি মধ্যম এবং দুটি নিম্ন স্কোর পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে এখনই বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সারণি ২ : গবেষণার ফলাফল : একনজরে নির্দেশকগুলোর স্কোর

ক্ষেত্র	নির্দেশক								
১. আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান (৭)	আইনি স্বাধীনতা	আওতা ক্ষমতা	আইনি ক্ষমতা	কমিশনারদের নিয়োগ	কমিশনারদের অপসারণ ও অব্যাহতি	কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা	সরকারের দ্বারা দুদকের অন্যায় রাজনৈতিক ব্যবহার		
২. অর্থ ও মানবসম্পদ (৯)	জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)	দুদকের বাজেট (প্রতুলতা)	দুদকের বাজেট (নিয়মিত, স্থিতিশীলতা)	কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা	কর্মী বাছাইয়ের শর্ত	কর্মীদের সংখ্যা (অনুপাতে)	কর্মীদের দক্ষতা (প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা)	কর্মীদের প্রশিক্ষণ	কর্মীদের স্থিতিশীলতা
৩. অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (৯)	দুদকে অভিযোগের (দুর্নীতি অভিযোগকারী/ প্রাপ্যতা)	অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়া	অনুসন্ধান করার সক্ষমতা	মামলার সংখ্যা (গড়)	দক্ষতা, পেশাদারিত্ব (অনুপাতে)	সাজাপ্রাপ্তের হার	প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সক্ষমতা	সম্পদ জব্দ ও পুনরুদ্ধার	তথ্যপ্রদানকারীর তথ্য গোপন ও সুরক্ষা
৪. প্রতিরোধ ও আউটরিচ কার্যক্রম (৯)	প্রতিরোধের জন্য বাজেট বরাদ্দের হার	দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্যোগ	সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা	সমন্বয় প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক সুপারিশ	আউটরিচ ও শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	আউটরিচ কার্যক্রমে অংশীজনের অংশগ্রহণ	গবেষণা ও জনমত যাচাই	তথ্য প্রচার ও প্রচারণা	প্রচারমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার
৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা (৫)	সরকারি পরিষেবার সহযোগিতা	অন্যান্য সংস্থার প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা	নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ	অন্যান্য দেশের দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা				
৬. জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার (৪)	নিয়মিত তথ্যসমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট	তদারকি ব্যবস্থা	অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়া	দুদক/ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিকার					
৭. দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা (৭)	দুদকের কর্তৃত্ব সম্পর্কে জনগণের আস্থা	দুদকের অভিযোগ প্রক্রিয়া অনুসরণ সম্পর্কে জনগণের আস্থা	দুদকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের আস্থা	দুদকের নিরপেক্ষতার আচরণ সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আস্থা	দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা	দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা (দুদকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এমন ব্যক্তি)	অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা (সরাসরি যোগাযোগ হয়নি এমন ব্যক্তি)		

যেসব নির্দেশকে দুদক উচ্চ স্কোর পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদাসহ যথেষ্ট পরিমাণ আইনি ক্ষমতা ও কাজের আওতা। দুদক আইনে দুদককে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যদিও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের ওপর এর সামান্য নির্ভরশীলতা রয়েছে। আইনে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। দুদকের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন এবং আইনে বর্ণিত অপসারণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে তাদের অপসারণ করা যায় না। দুদকের বাজেট যথেষ্ট, যা প্রতিবছরই টাকার অঙ্ক বেড়েছে। দুদকের কর্মীদের স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি বা পদত্যাগের হারও খুব কম।

দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও তদন্তের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ দুদকের দেখা যায়। দুদক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং মামলার সংখ্যাও যথেষ্ট। একটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে গত তিন বছরে দুদক ৩০ জনেরও বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মেয়র, সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সাবেক সচিব, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক, পরিচালক) এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। দুদক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রতিরোধের অবস্থা পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। যেসব ক্ষেত্রে দুদকের দুর্বলতা রয়েছে তা নিয়ে নিচের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১. আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান

দুদকের কার্যকারিতা ও ক্ষমতা ব্যবহারের কারণে এর পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সক্ষমতা দুদকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের আইনি ক্ষমতার প্রয়োগ কমিশনারদের স্বাধীন মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। তাদের মতে, যদিও চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ আপাতভাবে একটি ভালো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তথাপি প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়। যেহেতু বাছাই কমিটির দ্বারা বাছাইকৃতদের নাম ও যোগ্যতা নিয়োগের আগে প্রকাশ করা হয় না। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, যেহেতু আর্থিক বিষয়ে দুদককে সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং অতিরিক্ত খরচের জন্য জবাবদিহি করতে হয়, তাই এটি দুদকের স্বাধীনতা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের বিষয়। এর মাধ্যমে দুদকের কার্যক্রমসংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসন ও নিরপেক্ষতা সীমিত হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া দুদক রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয় বলে ধারণা রয়েছে। কারণ দুর্নীতির ঘটনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ উদ্যোগ দেখাতে পুরোপুরি সমর্থ হয়নি। কয়েকজন

বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেন যে কিছু ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট এবং সবার বিরুদ্ধে সমানভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তথ্যদাতাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে সরকার দুর্নীতির বিষয়টিকে বিরোধী দল বা ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এ জন্য তারা দুদকের ওপর নির্ভর করে।

৫.২. অর্থ ও মানবসম্পদ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের বাজেট গড়ে জাতীয় মোট বাজেটের শূন্য দশমিক ০২৫ শতাংশের বেশি ছিল না এবং এই হার প্রতিবছর কমেছে, যদিও দুদকের আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, বিদ্যমান জনবল অনুযায়ী যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং বিভিন্ন কার্যক্রম—যেমন তদন্ত, প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও মামলা পরিচালনার জন্য আরও বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন। সব জেলায় দুদকের কার্যালয় ও প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দুদকের আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে কর্মীদের দক্ষতা। দুর্নীতির তদন্তের ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন কর্মীদের তদন্ত সম্পর্কে বোঝার ঘাটতি রয়েছে এবং পুরোনো কর্মীরা সব সময় দুর্নীতির নতুন ধরন (যেমন অর্থ পাচার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে দুর্নীতি) ও কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এ ছাড়া দুদকের প্রশিক্ষণের বিষয়টিতেও পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের কর্মীদের জন্য ৪৭টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে ৯৫৬ জন কর্মী (দুদকের মোট কর্মীর ৫৩ শতাংশ) অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২৫টি প্রশিক্ষণ ছিল যা দুদকের কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কারিগরি বিষয়ের ওপর।

৫.৩. অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম

দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে এবং দুটি বিষয় মধ্যম মানের বিবেচ্য বিষয়।

প্রথমত, দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে, দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার ওপর জনগণের ধারণার বিবেচনায় এবং অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আগ্রহের কথা বিবেচনা করলে দুদকে দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অভিগম্যতার মাত্রা যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের মামলায় সাজা হওয়ার গড় হার ৪০ শতাংশের কম। একটি কার্যকর দুদকের জন্য এই হার আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়ত, দুদক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ এবং দুর্নীতির ধারা পরিবীক্ষণে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করে না। এখন পর্যন্ত নারী ও প্রান্তিক জনগণের জন্য বিভিন্ন চাহিদা নিরূপণে দুদকের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

দুর্নীতির তদন্তে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব একটি মধ্যম পর্যায়ের উদ্বেগের বিষয়। সাধারণত দেখা যায় দুদকের তদন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় না; যদিও দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, দুর্নীতির তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দক্ষ ও পেশাদার। অপর একটি উদ্বেগের ক্ষেত্র হচ্ছে, দুদকের (দেশ থেকে পাচার করা অর্থ ও দুর্নীতির কারণে প্রাক্কলিত ক্ষতির তুলনায়) স্বল্প পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ উদ্ধার ও জব্দ করার বিষয়টি। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিন বছরের মধ্যে দুদক আদালতের মাধ্যমে ৭২ দশমিক ৮১২ কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদ জব্দ ও উদ্ধার করেছে।

৫.৪. প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন বছরে দুদকের বাজেটের প্রায় ২ দশমিক ৬৫ শতাংশ প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হলেও দেশে বিদ্যমান দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট ও অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য গবেষণার ঘাটতি একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। গবেষণার জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ ছিল না। দুদক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন বছরে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সততা সংঘের মাধ্যমে বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করলেও আউটরিচ কার্যক্রম ও প্রতিরোধের জন্য তাদের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নেই। দুদকের প্রতিরোধ ও আউটরিচ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এগুলো প্রধানত বিভিন্ন উপলক্ষকে (যেমন আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও দুর্নীতিবিরোধী সপ্তাহ) কেন্দ্র করে নেওয়া হয়েছে। দুদকের দুর্নীতিবিরোধী তথ্যের প্রচারণা, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। দুদকের ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ, আধুনিকায়ন, সাহিত্য ও গবেষণা প্রবন্ধের তথ্যসহ আরও ব্যবহারবান্ধব করা প্রয়োজন।

৫.৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা

অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতার বিষয়টি অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়, যদিও দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলোতে (যেমন জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের পক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন, এশিয়া-প্যাসিফিক মানি লন্ডারিং গ্রুপ এবং এডিবি-ওইসিডি অ্যান্টি করাপশন ইনিশিয়েটিভস) কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশের অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতার বিষয়টি একটি মধ্যম পর্যায়ের উদ্বেগের বিষয়। দুদক কর্তৃপক্ষের মতে, তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ব্যাংক, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষকের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলেও অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদকের সহযোগিতার মাত্রা পর্যাপ্ত ও কার্যকর নয়।

৫.৬. জবাবদিহি ও তদারকি

দুদকের জবাবদিহি ও তদারকির ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বাহ্যিক কোনো তদারকির ব্যবস্থা না থাকা। আইন অনুযায়ী দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করে। কিন্তু দুদকের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কোনো স্বাধীন কমিটি নেই। যদিও নিয়মিতভাবে তদন্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য দুদকের তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য একটি শাখা রয়েছে; কিন্তু এই কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়া দুদকের কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ায় 'স্বার্থের দ্বন্দ্বে'র বিষয়টি এড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত না করাও একটি অন্যতম উদ্বেগের বিষয়।

৫.৭. দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা

সাধারণ মানুষের মধ্যে দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রেই দুদককে সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ এটিই দুদকের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। অনেকের মতেই দুদক এখন পর্যন্ত কার্যকর নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জরিপে দেখা যায়, ৮২ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা দুদক বা এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না এবং মাত্র ৯ দশমিক ১ শতাংশ (যারা দুদক সম্পর্কে জানে) বলেছে যে দুদক দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে ভালো কাজ করছে (গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার, ২০১৫, অপ্রকাশিত)। এ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ আইন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের কোনো ধারণা ও তথ্য নেই। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার ওপর দুদকের আচরণ নির্ভর করে বলে অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির ঘটনা নিরপেক্ষভাবে মোকাবিলার ক্ষেত্রে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কেও জনগণের ধারণা খুব ইতিবাচক নয়। বিশেষজ্ঞদের (নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক) মতে, দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দুদকের ওপর প্রয়োজনীয় অর্পিত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তাদের সম্পদ পর্যাপ্ত নয়।

৬. সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দুদককে আরও কার্যকর করার জন্য নিচের সুপারিশগুলোর প্রস্তাব করা হচ্ছে।

অর্থ ও মানবসম্পদ

১. ***দুদকের বাজেট বৃদ্ধি :*** নিচের খাতগুলোতে দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে :
   - অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য লজিস্টিক (যেমন যানবাহন, সরঞ্জাম, জব্দ করা সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা) সহায়তার ক্ষেত্রে;
   - দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম (যেমন গণশুনানি, গবেষণা);

- উচ্চমানের দক্ষতা ও সক্ষমতাসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগ;
- দুদকের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

২. ***দুদকের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির বিষয় পুনর্বিবেচনা*** : দেশের ৬৪টি জেলাতেই প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিক সুবিধাসহ দুদকের কার্যালয় থাকতে হবে। এ ছাড়া অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৩. ***কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি*** : দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ করতে হবে। নিয়োগের আগে বাছাই করা প্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতাসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এই নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বিবেচনা করতে হবে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত

৪. ***অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি*** : দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া, তদন্ত ও মামলা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রক্রিয়া সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও পরিচয় প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করে এমন হতে হবে। এ ছাড়া তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দুদককে যথাযথ কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৫. ***দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ*** : দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজাপ্রাপ্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য দুদককে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেমন তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের আগে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করা।

৬. ***সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ*** : দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম

৭. ***দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা*** : দুদককে তার শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া দুদককে তার কার্যক্রম মূল্যায়নের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

৮. ***উন্নত ওয়েবসাইট*** : দুদকের উন্নত ওয়েবসাইট থাকতে হবে; যেখানে নিচের বৈশিষ্ট্য বা তথ্য থাকবে :

- ব্যবহারকারীর সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ।

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার।
- দুর্নীতির ওপর লেখা ও গবেষণা প্রবন্ধের সংগ্রহসহ ব্যবহারবান্ধব ওয়েবসাইট।
- নিয়মিতভাবে হালনাগাদ তথ্য: দুদকের বাজেট, কর্মপরিকল্পনা, তদন্ত ও মামলার পরিসংখ্যান, গণশুনানি ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য।
- দুর্নীতি দমনসংক্রান্ত আইন ও বিধি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা

৯. ***অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি :*** দুদককে অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে এর নিজের কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার ক্ষেত্রে যেখানে 'স্বার্থের দ্বন্দ্বের' আশঙ্কা রয়েছে।

জবাবদিহি ও তদারকি

১০. ***স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা :*** দুদকের কাজের মূল্যায়ন, তদারকির ও পরামর্শ প্রদানের জন্য উচ্চমাত্রার সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি, বর্তমান বা সাবেক আমলা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে।

দুদকের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা

১১. ***জনগণের আস্থা বৃদ্ধি :*** দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে নিচের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সাধারণ জনগণ দুদকের সাফল্য সম্পর্কে জানতে ও সচেতন হতে পারে।
- দুদকের কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময় অনুযায়ী তদন্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল

১. ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। আর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হলো 'জ্ঞান আহরণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : ২২)।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ও দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষকদের পাঠদানে উচ্চতর জ্ঞান ও সক্ষমতার ওপর। এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে। যেমন শিক্ষক নিয়োগ মেধানির্ভর নয়। শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় একাডেমিক যোগ্যতা মূল পরিমাপক হওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পৃক্ততা অন্যতম নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়, 'রাজনৈতিক মেরুকরণ' দ্বারা প্রভাষক নির্বাচন করায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারী শিক্ষকদের মধ্যে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের উপস্থিতি, শিক্ষকদের 'বর্ণভিত্তিক'[1] দলের সদস্য তথা 'ভোট ব্যাংক'-এর প্রসার ঘটাতে গিয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির সূত্রপাত ঘটে ইত্যাদি। অন্যদিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও গণমাধ্যমে নানা তথ্য উঠে এলেও প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসংক্রান্ত নিয়মতান্ত্রিক গবেষণার অভাব রয়েছে। ইতিমধ্যে টিআইবি 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' এবং 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

---

* ২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

[1] সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ শিক্ষকই পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রং বা বর্ণভিত্তিক প্যানেল, যেমন সাদা প্যানেল, নীল প্যানেল, গোলাপি প্যানেল ইত্যাদি নামে কোনো না কোনো দলের অধীনে শিক্ষক রাজনীতি করেন।

দুর্নীতি : স্বরূপ ও প্রতিকার' শীর্ষক দুটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি এ গবেষণার কাজটি পরিচালনা করেছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা উত্তরণে সুপারিশ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা,
- প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা
- প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ করা।

৩. গবেষণার পরিধি

গবেষণায় শুধু প্রভাষক নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রবেশদ্বার হচ্ছে প্রভাষক এবং এই পদে সর্বোচ্চসংখ্যক নিয়োগ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় প্রভাষক নিয়োগ-সম্পর্কিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার ধাপ, নিয়োগ কমিটির গঠনকাঠামো, সদস্য নির্বাচন বা অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও গবেষণা-সম্পর্কিত নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভাগীয় ও ইনস্টিটিউট-প্রধান, শিক্ষক সমিতির নেতা, সাধারণ শিক্ষক (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক), বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ও সদস্য, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী, সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ (বর্তমান ও সাবেক) বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলের অনুসারী ও দলনিরপেক্ষ শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগসংক্রান্ত বিধিবিধান। যেমন সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ, আইন ও বিধিমালা, প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও তদন্ত প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম, ওয়েবসাইট ইত্যাদি। এই গবেষণায় মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের জন্য প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কয়েকটি ধরনে যথা–সাধারণ (১৫টি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (নয়টি),

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (সাতটি), কৃষি (চারটি) ও চিকিৎসা (দুটি) বিভক্ত করা হয়। এরপর এই ধরনগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান (কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়) ও প্রতিষ্ঠাকাল (নতুন-পুরোনো) ইত্যাদি বিবেচনা করে সাধারণ আটটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুটি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি দুটি এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। গবেষণাটি ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০০১ থেকে ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত প্রভাষক নিয়োগসংক্রান্ত তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব বিভাগের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৫. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে—এমন মোট সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকসংখ্যা ১২ হাজার ৪৭ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১৯। শিক্ষকদের মধ্যে প্রভাষক ২ হাজার ৮৩০ জন, যা মোট শিক্ষকের ২৪ শতাংশ। শিক্ষকদের মধ্যে নারী শিক্ষক ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষক ৭৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত স্বায়ত্তশাসিত ও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ, আইন ও বিধিমালা মেনে চলে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য কিংবা উপ-উপাচার্যের সভাপতিত্বে প্রভাষক বাছাই-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রভাষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ তথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হলো প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট। নিয়োগবিষয়ক যেকোনো নিয়ম তৈরি বা পরিবর্তনের জন্য সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সিন্ডিকেট নিয়োগ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ বা বাতিল করতে পারে।

৬. প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া

প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত ছয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয় এবং প্রতিটি ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও নিয়োগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কমিটি জড়িত থাকে। প্রথমে বিভাগ থেকে চাহিদা নির্ধারণ করে ডিনের সুপারিশক্রমে পেশ করা হয় ডিনস কমিটিতে। ডিনস কমিটির পক্ষ থেকে যাচাইয়ের পরে তা পুনরায় যাচাই ও অনুমোদনের জন্য রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল বরাবর প্রেরণ করা হয়। নতুন পদ অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পাঠাতে হয়। কমিশন বাজেট সংস্থানের ওপরে নির্ভর করে পদসংখ্যা অনুমোদন দেয়। পদ অনুমোদন হলে সিন্ডিকেট নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ করে এবং রেজিস্ট্রার কার্যালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। আবেদন জমা হলে রেজিস্ট্রার কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রার্থিতা মূল্যায়ন করে। মূল্যায়ন শেষে রেজিস্ট্রার কার্যালয় প্রার্থীদের পরীক্ষার সময়সূচি সম্পর্কে অবহিত করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

নিয়োগ কমিটি গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে। নিয়োগ পরীক্ষার পরে নিয়োগ কমিটি সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগদানের জন্য সিন্ডিকেট থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করে।

চিত্র ২ : প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার ধাপ

৭. প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৭.১ নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা না থাকা : কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা নেই। অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা হবে, নাকি লিখিত পরীক্ষা হবে, বোর্ড সদস্যদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রশ্নের কাঠামো কী হবে, নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি ও কাঠামো কী হবে, নিয়োগের নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে কি না ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিয়োগের নিয়মকানুন তৈরির সুযোগ তৈরি হতে পারে। নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারা থাকতে পারবেন বা তাদের যোগ্যতা কী হবে, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগসংশ্লিষ্ট বিধিমালায় অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কার্যকর শাস্তির বিষয়েও উল্লেখ নেই।

৭.২ নিয়োগের চাহিদা তৈরি ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকা : প্রভাষক নিয়োগের চাহিদা সঠিকভাবে যাচাই না করা এবং তা সময় অনুযায়ী উপস্থাপন করার ব্যাপারে

জবাবদিহির ব্যবস্থা অনুপস্থিত। কোনো বিভাগে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা এবং শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা থাকলেও নিয়োগের চাহিদা না দিলে, আবার চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে চাহিদাপত্র দিলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে নিয়োগ চাপিয়ে দেওয়া হলেও এসবের জন্য কাউকে জবাবদিহি করার কার্যকর ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

৭.৩ সিন্ডিকেট কর্তৃক ইচ্ছামাফিক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও নিয়োগ কমিটি গঠনের সুযোগ : প্রভাষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা সিন্ডিকেটের হাতে। আর সিন্ডিকেটে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থনকারী সদস্য বা মনোনীত সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় নির্দিষ্ট কোনো প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত জুড়ে দেওয়া বা যোগ্যতা শিথিল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন সিজিপিএ হ্রাস-বৃদ্ধি করা, কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যেকোনো আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ, কর্তৃপক্ষের নিয়োগ দিতে কিংবা নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কার্ড ইস্যু করতে বাধ্য না থাকা, পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় কার্যত নিয়োগ-প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবিশেষের পক্ষে প্রভাবিত করে এবং প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। আবার নিয়োগ বোর্ড গঠনও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সিন্ডিকেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় নিয়োগ বোর্ডে তাদের মতাদর্শের অনুসারী ও পছন্দের ব্যক্তিদেরই বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টিতেই নিয়োগ বোর্ডে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। নিয়োগ বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাদের মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের বা তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.৪ প্রভাষক নিয়োগে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের ভূমিকা : নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ও সিন্ডিকেটের প্রধান হিসেবে উপাচার্যের অভিপ্রায় মোতাবেক নিয়োগ কার্যক্রম প্রভাবিত করার সুযোগ উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কার্যত তাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় উপাচার্যরা তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের দ্বারা সিন্ডিকেট গঠন, নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ, নিয়োগ কমিটি গঠন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থকদের দ্বারা নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

৭.৫ পরীক্ষার ফলাফল যাচাই ও অভিযোগ দায়েরের সুযোগ না থাকা : প্রার্থী কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষার জন্য আবেদন করার কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই। ফলে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের ইচ্ছামাফিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে প্রভাষক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করা বা অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই।

৭.৬ তথ্য জানার সুযোগ না থাকা : বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া নথির বিপরীতে প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা ও নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বাছাই না করার কারণ ও নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ প্রার্থীদের নেই।

৮. নিয়োগপূর্ব অনিয়ম ও দুর্নীতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের অনিয়মটি অনেক ক্ষেত্রেই একাডেমিক পড়াশোনার সময় থেকে শুরু হয়। শিক্ষক কর্তৃক পছন্দের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রভাবিত করা ও পরবর্তী সময়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত গবেষণায় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার বিনিময়ে আগে থেকে একাডেমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, ক্ষেত্রবিশেষে নারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একাডেমিক পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন বলে দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের আগেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ ঠেকাতে অপছন্দের শিক্ষার্থীকে একাডেমিক পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার উদাহরণও বিদ্যমান রয়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়।

আবার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসারী নিয়োগের জন্য দ্রুত একাডেমিক ফলাফল প্রকাশ করার উদাহরণ রয়েছে এবং অপছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ ঠেকাতে ফলাফল দেরিতে প্রকাশ করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কোনো বিভাগের একজন প্রার্থীর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একাডেমিক ফলাফল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং তিনি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী। ওই সময়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেলে তার স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়ায় তিনি আবেদন করতে ব্যর্থ হবেন বলে তার পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। একইভাবে ঠিক তার উল্টো চিত্রও নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

৯. নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধাপ ১ ও ২ : চাহিদা নির্ধারণ বা পেশ, যাচাই ও পদ অনুমোদন

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, শিক্ষক নিয়োগের চাহিদাপত্র দেওয়ার আগে শিক্ষকদের কাজের চাপ যথাযথভাবে পরিমাপ করা হয় না। একজন শিক্ষকের যে পরিমাণ কোর্স পড়ানোর নিয়ম রয়েছে, সেই পরিমাণ কোর্স পড়াচ্ছেন কি না, তা সঠিকভাবে যাচাই না করে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা অনুসারী তৈরি করার জন্য পদ শূন্য থাকলেই শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা দেওয়া হয়। আবার যেসব বিভাগের শিক্ষকদের বাইরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সুযোগ বেশি অথবা যারা ভিন্ন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান বা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই সান্ধ্যকালীন কোর্সে সময় দেন, সেসব বিভাগে নিজেদের কাজের চাপ

কমানোর জন্য কৃত্রিম শিক্ষক স্বল্পতা দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা পেশ করা হয়। এমনকি কখনো কখনো কোনো নতুন কোর্স চালুর প্রস্তাব করা হয় শিক্ষক বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। প্রস্তাবিত নতুন কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী বা ওই কোর্স পড়ানোর মতো পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ বা অবকাঠামো না থাকলেও সিলেবাসে কোর্স থাকা বা নতুন কোর্স চালুর কারণ বা যৌক্তিকতা দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা পেশ করা হয়। এভাবে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে ওই শিক্ষকদের সঠিকভাবে ক্লাস বণ্টন করা সম্ভব হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি কোর্স দুজন শিক্ষক কর্তৃক পড়ানোর উদাহরণ রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য আলাদা কক্ষ এমনকি বসার স্থান পর্যন্ত বরাদ্দ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অনেক সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের নিয়োগ ঠেকাতে কিংবা প্রভাবশালী শিক্ষকদের আধিপত্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে অব্যাহত রাখতে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা না দেওয়া বা প্রলম্বিত করার তথ্য পাওয়া যায়। যেসব বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা থাকায় শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি থাকে এবং একই শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে পাঠদান করতে হয়, সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও বিভাগের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। আবার নিয়োগের চাহিদা অনুমোদনের ক্ষেত্রে একাডেমিক কাউন্সিল সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করেই ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুসারী তৈরির জন্য যেকোনো চাহিদা অনুমোদন দেয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অযৌক্তিক বা অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের চাহিদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ধাপ ৩ : নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্তৃক সুবিধা অনুযায়ী প্রার্থিতার যোগ্যতা পরিবর্তন, যেমন গ্রেডিং হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা 'নির্দিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা বা থিসিস থাকতে হবে' ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন নীতিনির্ধারকের সন্তান স্নাতক পর্যায়ের ফলাফলে সিজিপিএ ৩.৫০ অর্জন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় তাকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান নিয়োগের শর্ত তথা সিজিপিএ ৩.৫০ থেকে কমিয়ে ৩.২৫ করা হয় এবং ওই নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আগের শর্তে ফিরে যাওয়া হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে নিয়োগের শর্তে 'বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর জন্য যেকোনো শর্ত শিথিলযোগ্য' বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ এই বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী বলতে কী বোঝানো হবে তা স্পষ্ট করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে না। ফলে এই 'বিশেষ যোগ্যতা'কে অপব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করার উদাহরণ রয়েছে।

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় বিভাগ থেকে প্রভাষক নিয়োগের চাহিদা জমা না দেওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য সিন্ডিকেট থেকে বিভাগকে না জানিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেছে, সঠিকভাবে প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা যাচাই না করে শুধু ভোট বৃদ্ধি ও অনুসারী সৃষ্টির জন্য নতুন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট চালু করা হয়। আবার একটি বিভাগ ভেঙে একাধিক বিভাগ তৈরির মাধ্যমে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম অনুযায়ী বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরিবর্তে একই মতাদর্শের অনুসারী বা পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য দূরে অবস্থানকারী প্রার্থীদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কম প্রচারিত বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কখনো কখনো পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য অন্য প্রার্থীরা যাতে আবেদন করতে না পারেন, সে জন্য বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের জন্য স্বল্প সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

ধাপ ৪ : আবেদনপত্রের প্রাথমিক বাছাই ও মূল্যায়ন

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আবেদনপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কার্যালয় কর্তৃক যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে কোনো কোনো সময় ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভিন্ন-রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থী বা অপছন্দের প্রার্থীদের কম যোগ্যতাসম্পন্ন দেখানোর জন্য তথ্য গোপন করা বা মেধাতালিকায় মেধাক্রম উল্লেখ না করে শুধু শ্রেণি বা গ্রেড উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারীর ক্ষেত্রে শুধু 'প্রথম স্থান অধিকারী' বলে উল্লেখ করা; থিসিস, প্রকাশনা বা চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রার্থীদের তথ্যাবলির তালিকায় যোগ্যতা হিসেবে তা উল্লেখ না করা। আবার কখনো কখনো আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া সনদ, প্রকাশনার কপি, ড্রাফটের কপিসহ বিভিন্ন নথি নষ্ট করে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে তা জমা দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের একাংশের অভিপ্রায় মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের কর্মচারীদের একাংশ দ্বারা এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করার অভিযোগ রয়েছে। আবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আবেদনের সব শর্ত পূরণ করেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ না পাওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ না করেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের অনুসারী ('ফলোয়ার') তৈরি ও ভোট বৃদ্ধির ('ভোট ব্যাংক') লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা পছন্দের প্রার্থী, যেমন পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, একই এলাকার প্রার্থীদের একাডেমিক ফলাফলের যোগ্যতা পূরণ না করলেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত করা এবং ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের একাডেমিক ফলাফলের যোগ্যতা পূরণ করলেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত না হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

ধাপ ৫ : নিয়োগ পরীক্ষা

নিয়োগ কমিটি গঠন : প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যদের পছন্দের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা তাদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। উপাচার্যের অভিপ্রায় মোতাবেক নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এ ধরনের মনোনয়ন দেওয়া হয়। কখনো কখনো উপাচার্য তার পছন্দের প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কিন্তু বন্ধুস্থানীয় হলে তাকেও নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। আবার একই মতাদর্শের অনুসারী কিন্তু উপাচার্যের অপছন্দের শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় না। সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞদের উপাচার্যরা মনোনয়ন দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো কখনো পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন শিক্ষককেও নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষার আগেই কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ করা হবে তা নিয়োগ কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত মৌখিক পরীক্ষা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

পরীক্ষা গ্রহণ : মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় অপছন্দের প্রার্থী বা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা পূর্বনির্ধারিত প্রার্থী না হলে তাকে বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন না করে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা মন্তব্য করে বিব্রত করা হয়। যেসব প্রার্থী সম্পর্কে নিয়োগ কমিটির নেতিবাচক ধারণা থাকে তাদের মৌখিক পরীক্ষায় অল্প সময় দেওয়া, কম প্রশ্ন করা বা অবান্তর প্রশ্ন করা বা ক্ষেত্রবিশেষে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় না। আবার পছন্দের প্রার্থী বা একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থী বা পূর্বনির্ধারিত প্রার্থী হলে তাকে সংশ্লিষ্ট না হলেও অকারণে প্রশংসা করা হয়। কখনো কখনো নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা অপছন্দের প্রার্থীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন ও কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে দেন। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের সবার অনুমোদন ছাড়া প্রশ্ন তৈরি, আগে থেকেই পছন্দের প্রার্থীকে প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়া, পরীক্ষার খাতা নির্বাচনী বোর্ডের সব সদস্যের মাধ্যমে যাচাই না করা কিংবা তাদের অবহিত না করা, পছন্দের বা নির্ধারিত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

নিয়োগের সুপারিশ করা : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে যে কয়টি পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে একজন শিক্ষক বেশি নিয়োগ দেওয়া যাবে। কিন্তু ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই নিয়ম লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

কখনো কখনো অর্গানোগ্রামে পদ থাকলে তার বিপরীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন নিয়ে তাদের স্থায়ী করা হয়। অথচ বিভাগ থেকে শিক্ষক নিয়োগের যে চাহিদা পেশ করা হয় তা বিবেচনা করা হয় না। আবার অনেক সময় উপাচার্য কোনো প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য রাজনৈতিক বা স্থানীয় কোনো নেতা বা কোনো প্রভাবশালী শিক্ষক কর্তৃক প্রভাবিত হন। এমন পরিস্থিতিতে উপাচার্যের নিজস্ব প্রার্থী, প্রভাবশালী শিক্ষকের প্রার্থী, রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দের প্রার্থী, বিশেষজ্ঞের পছন্দের প্রার্থী ('পকেট ক্যান্ডিডেট') ও বিভাগীয় প্রধানের প্রার্থী সবাইকে নিয়োগের চেষ্টা করা হয়। ফলে বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কখনো কখনো দ্বিগুণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিন গুণ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার তথ্য পাওয়া গেছে। নিয়োগ বোর্ডের কোনো সদস্য নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন না করলে বা বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করলে তিনি উপযুক্ত যুক্তিসহকারে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিতে পারেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষকরা প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও নিজেদের ঝামেলামুক্ত রাখতে বা হয়রানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'নোট অব ডিসেন্ট' দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের আঁতাত ও সমঝোতার মাধ্যমে তাদের সবার পছন্দের প্রার্থীর সবাইকে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হয় বলে 'নোট অব ডিসেন্ট' দেওয়ার সুযোগ বিনষ্ট হয়।

ধাপ ৬ : চূড়ান্ত অনুমোদন

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগ বোর্ড থেকে যেসব প্রার্থীর নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় সিন্ডিকেট তা কোনোরকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন দিয়ে দেয়। যদি কেউ 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে থাকেন তাহলে সেটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিয়োগ চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অনুসরণ করা হয় না। যেহেতু নিয়োগ বোর্ডের অধিকাংশের অনুমোদন হলে যেকোনো নিয়োগ দেওয়া সম্ভব, সেহেতু সিন্ডিকেট 'নোট অব ডিসেন্ট'কে গুরুত্ব না দিয়েই নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টিতে 'নোট অব ডিসেন্ট'কে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরেকটি অনিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগের সুপারিশ অনুমোদন করা। গবেষণায় দেখা গেছে, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি বিভাগের জন্য প্রকাশিত ১৪টি বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৪৪ জনের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৯২ জন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বিগুণেরও বেশি। অতিসম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজনের বিপরীতে নয়জন শিক্ষক নেওয়ার তথ্য রয়েছে।

১০. অনিয়ম-দুর্নীতির প্রভাবক

১০.১ রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক দল ভারী করা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষকদের 'দল ভারী' বা ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিশেষজ্ঞরা তাদের পছন্দের বা একই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীদের নিয়োগ দেন। এ ক্ষেত্রে শুধু প্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, তার পরিবারের সদস্যরা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক তা-ও যাচাই-বাছাই করা হয়। এমনকি কোনো কোনো প্রার্থী অন্য প্রার্থীদের মতাদর্শ-সম্পর্কিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়ে থাকেন নিজেকে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখার জন্য। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকেই প্রার্থীরা নিজেদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রমাণ করার জন্য সাধ্যমতো ক্ষমতাসীন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী শিক্ষক, ছাত্রনেতা ও স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে সুপারিশ পাওয়ার চেষ্টা করেন। আর রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। প্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাইয়ের জন্য বিশ্বদ্যালয়ের প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

চিত্র ৩ : অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত অংশীজনের আন্তসম্পর্ক

১০.২ আঞ্চলিকতা

গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন অঞ্চলের অধিবাসী তার ওপর নির্ভর করে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে এলাকায় অবস্থিত সেই জেলা বা পাশাপাশি জেলার প্রার্থীদের নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য, বিশেষজ্ঞ বা নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের নিজ জেলা বা এলাকার লোকদের নিয়োগ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। গবেষণার তথ্যে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার এই চিত্র ঢাকার বাইরের প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে। যেসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, সেসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমর্থন বা মতাদর্শকে সব সময় প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেক কম।

১০.৩ স্বজনপ্রীতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হচ্ছে স্বজনপ্রীতি বা আত্মীয়দের নিয়োগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ তাদের পরিবারের সদস্য ও নিকটাত্মীয়দের নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তির পর থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের তদবির শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান, ডিন, উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির প্রভাবশালী সদস্য, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে তদবির করেন। আত্মীয়স্বজনদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আঞ্চলিকতার বিষয়গুলো তেমনভাবে গুরুত্ব পায় না।

১০.৪ ধর্মীয় পরিচয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ সমর্থনের বিষয়টি যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একটি বিশেষ দলের সমর্থক মনে করা হয়, সেহেতু একটি সময়ে সর্বোচ্চ একাডেমিক ফলাফল করলেও নিয়োগ দেওয়া হতো না। যেমন একটি সময়ে সংখ্যালঘুদের রেকর্ড পরিমাণ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সেই সময়ে মেধাবী সংখ্যালঘু প্রার্থীর (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারী) নিয়োগ ঠেকানোর জন্য পরীক্ষার ফলাফল দেরিতে প্রকাশ করা হতো, বছরের পর বছর নিয়োগের জন্য চাহিদা পেশ করা বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতো না, বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও বারবার তাদের পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হতো না কিংবা করা হলেও মৌখিক পরীক্ষায় অবান্তর প্রশ্ন করে হয়রানির মাধ্যমে অযোগ্য বলে প্রমাণ করা এবং নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আবার আরেকটি সময়ে সংখ্যালঘু কর্তৃক নিশ্চিত ভোটের আশায় সংখ্যালঘুদের সুযোগ দেওয়ার জন্য নিয়োগে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১০.৫ আর্থিক লেনদেন

গবেষণায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে তিন লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। আর্থিক লেনদেনের এই প্রবণতা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুলনামূলক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী অংশীজনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন হলে ভালো একাডেমিক ফলাফল, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায় না।

গবেষণায় এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে উপাচার্য, শিক্ষকনেতা, রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, ছাত্রনেতা, ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তবে এসব ব্যক্তি সাধারণত নিয়মবহির্ভূত অর্থ সরাসরি গ্রহণ করেন না। রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আত্মীয় বা পরিবারের সদস্য, ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক কর্মীদের মাধ্যমে নগদে বা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করার অভিযোগ রয়েছে।

১১. অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশীজনের সম্পৃক্ততা থাকে। অভ্যন্তরীণ অংশীজনের মধ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, অনুষদের প্রধান বা ডিন, বিভাগীয় বা ইনস্টিটিউট-প্রধান, শিক্ষক সমিতির ক্ষমতাসীন দলের নেতা, রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতা ও ছাত্রনেতাদের একাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অংশীজনদের মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ইউজিসির কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের একাংশ উল্লেখযোগ্য। প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের। এ কারণে প্রার্থীরা নিয়োগের জন্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের একাংশ, সরকারের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ আছে এমন প্রভাবশালী শিক্ষকনেতা, ইউজিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একাংশ ও প্রভাবশালী বা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একাংশের মাধ্যমে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যকে প্রভাবিত কর থাকেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নিয়োগসংশ্লিষ্ট অংশীজনের (বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই) সঙ্গে যার নেটওয়ার্ক যত বেশি শক্তিশালী কিংবা নিয়োগ বোর্ডকে প্রভাবিত করার সুযোগ বেশি, তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

১২. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় জবাবদিহির তোয়াক্কা না করে নিজেদের মতো নিয়োগের নিয়মকানুন তৈরি ও বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মেধাবীদের বঞ্চিত করে তুলনামূলক কম মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা দেখভাল করার জন্য কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকা, তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা, সঠিকভাবে বিভাগীয় চাহিদা নির্ধারণ না করা, শর্ত ভঙ্গ করে নিয়োগ দেওয়া, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া, একাডেমিক ফলাফল প্রভাবিত করার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত মেধাবীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দিয়ে অনুসারী তৈরি বা দল ভারী করা বা ভোটার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কম মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া সাধারণ চর্চায় পরিণত হয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য শাস্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নিয়োগসংশ্লিষ্ট অংশীজন সংঘবদ্ধভাবে পুরো নিয়োগ-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক মতাদর্শ, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় পরিচয়, শিক্ষকদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনায় ও বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত রেখেছেন।

অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরের কাজ, যেমন শিক্ষক রাজনীতিতে অধিকতর সময় ব্যয় করছেন। অথচ শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব, যেমন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, গবেষণা কার্যক্রম ও মানসম্মত প্রকাশনায় উদ্যোগী হওয়াসহ জ্ঞান তৈরি ও চর্চার প্রতি আগ্রহী হতে কম দেখা যায়। শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া ও শিক্ষার পরিবেশ রাজনীতিকীকরণের ফলে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানসহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি ব্যাহত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেলেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগবিধিমালার সঠিক প্রয়োগ, নিরপেক্ষ নিয়োগ বোর্ড গঠন ও একাডেমিক ফলাফলকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগ হওয়ায় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নিয়োগের উদাহরণও বিদ্যমান রয়েছে।

১৩. সুপারিশ

১. **পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন** : প্রভাষক নিয়োগের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করতে হবে। ওই নীতিমালায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

ক. *নিয়োগ-চাহিদা যাচাই ও উপস্থাপন* : বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের কর্মভার সঠিকভাবে বিবেচনা করে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা উপস্থাপন করতে হবে। নিয়োগের

চাহিদা সঠিকভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা তৈরি ও যাচাইয়ের জন্য কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ. ***আবেদনের যোগ্যতা :*** প্রভাষক পদে আবেদন করার যোগ্যতা বা নিয়ম আগে থেকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে 'বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখের মাধ্যমে প্রাধান্যের সুযোগ' না রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে অপরিহার্য ক্ষেত্রে 'বিশেষ যোগ্যতা' বলতে কী বোঝানো হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

গ. ***নিয়োগ কমিটি গঠন :*** প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ কমিটি গঠনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ওই নীতিমালায় নিয়োগ কমিটিতে যেসব বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তাদের কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান নিয়োগ বোর্ড বা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে। কমিটিতে যারা থাকবেন :

- সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন (যিনি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন)
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক (চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হলে অন্য শিক্ষক), যাকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ।

ঘ. ***বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ :*** প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টাল বা জব পোর্টাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিভাগীয় ওয়েবসাইটসহ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সর্বাধিক প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আবেদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে।

ঙ. ***নথি প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা :*** যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্রের সঙ্গে নথি জমা দেওয়ার পরে তার প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা নেই, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নথি প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চ. ***প্রার্থিতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও ধাপ :*** স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থিতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রার্থীদের আবেদন সাপেক্ষে তা জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ. ***নিয়োগ পরীক্ষার কাঠামো ও নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া :*** নিয়োগ পরীক্ষায় একাডেমিক ফলাফল, ডেমোনস্ট্রেশন ক্লাস বা উপস্থাপনা, মৌখিক পরীক্ষায়, আলাদা নম্বর রাখাসহ সব অংশে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (ফরমেট) থাকতে হবে এবং নম্বর দেওয়ার পরে তার নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জ. নোট অব ডিসেন্ট : 'নোট অব ডিসেন্ট'কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। সিন্ডিকেটে নোট অব ডিসেন্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাধ্যবাধকতা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঝ. অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি : নিয়োগসংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও কার্যকর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঞ. তথ্যের উন্মুক্ততা : প্রার্থীদের আবেদনসাপেক্ষে নিয়োগসংক্রান্ত সব তথ্য জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে, বিশেষ করে প্রার্থীদের একাডেমিক যোগ্যতা ও নিয়োগ পরীক্ষায় সব ধাপের ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ট. বিধি লঙ্ঘনে জবাবদিহি : নিয়োগসংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্যকর জবাবদিহি ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. **উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন :** উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড ও নিয়োগ-প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে। এ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, ভালো একাডেমিক ফলাফল ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, যেমন বিভাগীয় প্রধান ও ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, কর্মজীবনের রেকর্ড ইত্যাদি যাচাইসহ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক একাডেমিক কাউন্সিলের মতামত নেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৩. **শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম সীমিতকরণ :** শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে কেবল পেশাগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪. **ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধকরণ :** একাডেমিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে, যেমন প্রশ্নপত্র তৈরি ও খাতা মূল্যায়নে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে একাধিক শিক্ষক নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় (এপ্রিল ২০১৫-মার্চ ২০১৬)*

মনজুর ই খোদা ও নাজমুল হুদা মিনা

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবির গবেষণায় (অক্টোবর ২০১৩) এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিকভাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দুটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। ওই গবেষণা দুটিতে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী দুই বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ধারাবাহিকভাবে এসবের ৩৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি গত এক বছরে (২০১৫-১৬) বাকি ৬৮টি উদ্যোগের অগ্রগতির পর্যালোচনায় এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য গত এক বছরে (এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা এবং এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন, যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মী, কারখানার মালিক, পোশাকশ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্য

* ২০১৬ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যাচাই-বাছাই করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা

টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ফলোআপ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত ৩৪টি উদ্যোগ বাদে বাকি ৬৮টি উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে গৃহীত ৬৮টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১২ শতাংশ (৮টি) উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৫৩ শতাংশ (৩৬টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ১৬ শতাংশ (১১টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীরগতিসম্পন্ন এবং ১৯ শতাংশ (১৩টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

চিত্র ৪ : ২০১৩-১৬ সালে মোট ১০২টি উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র

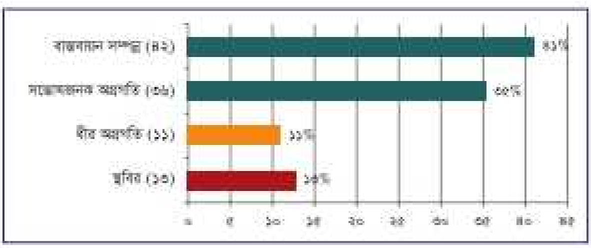

সার্বিকভাবে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের ২০১৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৪১ শতাংশ (৪২টি) উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩৫ শতাংশ (৩৬টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ১১ শতাংশ (১১টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীরগতিসম্পন্ন এবং ১৩ শতাংশ (১৩টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা

সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে প্রস্তাবিত ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন, ইপিজেড শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিতে ইপিজেড শ্রম আদালত ও শ্রম অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ পাস, তৈরি পোশাক

খাতের জন্য আলাদা কল্যাণ তহবিল গঠন, শ্রমিকদের আইনগত সহায়তার জন্য আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার গাইডলাইন তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি (এনটিসি) কর্তৃক সরকারি তদারকি সংস্থাগুলোর পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিসম করার জন্য একটি ড্রাফট প্রটোকল অনুমোদন, কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন এবং শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া পরিকল্পনামাফিক কলকারখানা ও রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অন্যদিকে বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ মন্ত্রিসভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে, বর্তমানে এটি আইন মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত ইপিজেড শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের আদলে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের কথা বলা হলেও, গণভোটে ৫০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি আদায় এবং ইপিজেড কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বিধান রাখার মাধ্যমে বিষয়টি কঠিন করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫তে অংশগ্রহণ কমিটি গঠনে এবং পরবর্তী সময়ে সেফটি কমিটি নির্বাচনে মহাপরিদর্শকের ভূমিকা স্পষ্ট না করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে এখনো অস্পষ্টতা বিদ্যমান। অপরদিকে বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সেফটি কমিটি গঠনের তাগিদ দেওয়া হলেও, এখন পর্যন্ত খুবই অল্পসংখ্যক কারখানায় এই কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অপরদিকে রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়।

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরে কারখানা স্থাপনে লাইসেন্স দেওয়া ও নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধে সীমিত আকারে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নথি আপলোড-সংক্রান্ত বিভিন্ন অ্যাপস অকার্যকর হওয়া এবং প্রচারণার অভাবের অভিযোগ রয়েছে। ফলে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদন নেওয়া হচ্ছে। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তাবিষয়ক অভিযোগ দিতে কলকারখানা অধিদপ্তরে 'হটলাইন' স্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব ও এ-সম্পর্কিত প্রচারণার অভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রম পরিদপ্তরে একটি পৃথক হটলাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও, তা স্থাপন করা হয়নি। শ্রম পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে কলকারখানা অধিদপ্তরের হটলাইন শেয়ার করা হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মালিকদের সঙ্গে যোগসাজশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আগে এ ক্ষেত্রে আগ্রহী শ্রমিকদের পরিচয় প্রকাশের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের

ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। রাজউকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। একইভাবে ঢাকা ও ঢাকার কাছের শিল্পাঞ্চলে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে তা এখনো স্থাপিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় অবস্থিত পোশাক কারখানাগুলো স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মুন্সিগঞ্জে পোশাকপল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এটির সার্বিক দায়িত্ব বিজিএমইএকে দেওয়া হয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক জমি ক্রয়ের সম্ভাবনায় প্রস্তাবিত এলাকার জমির মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে এই কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা

প্রায় ৯২ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে এবং অধিকাংশ রপ্তানিমুখী কারখানায় শ্রমিকদের জরুরি নম্বরসহ পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। বিজিএমইএ সব কারখানার শ্রমিকদের একটি সমন্বিত ডেটাবেইস গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্টের 'সিপ' প্রজেক্টের আওতায় ৪৩ হাজার ৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরির ব্যবস্থা চলমান। এ ছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 'স্টেপ' ও 'নারী' প্রজেক্টের আওতায় ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ক্র্যাশ কোর্স পরিচালনা করছে। এ ছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে অনেকাংশে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে শ্রম আইন সংশোধন ও শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও, সব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কোনো ধরনের মজুরি ছাড়া কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো কারখানায় শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা বা চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ রয়েছে। প্রায় ৯২ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা হলেও, বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুসারে অধিকাংশ কারখানায় নিয়োগপত্র, জরুরি ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র, বার্ষিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হলেও, কোথাও কোথাও নৈমিত্তিক ছুটি এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়ে ইচ্ছাকৃত চাকরি ছাড়ার পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বিজিএমইএর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরিপত্র জারির মাধ্যমে শ্রমিকের সর্বোচ্চ

অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা দৈনিক দুই থেকে চার ঘণ্টায় পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির কারণে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ স্থগিত করা হয়েছে।

২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের পর এখন পর্যন্ত ৩৫১টি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে নিবন্ধিত মোট ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৮৩টি। তবে এর মধ্যে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমানে সক্রিয় অবস্থায় নেই। অর্থাৎ দেশের মোট ১০ শতাংশের কম কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের মানসিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সচেতনতা ও সদিচ্ছার অভাবের কারণে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত গতি পাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় উদ্যোগ, ইউরোপীয় বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) এবং মার্কিন বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় শতভাগ কারখানায় প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করেছে। জরিপ-পরবর্তী সুপারিশ অনুযায়ী মোট ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা এবং ৪২টি কারখানা আংশিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২৫টি এবং অ্যাকর্ড পরিদর্শিত দুটি কারখানার সংস্কার সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৪ শতাংশের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়। জাতীয় উদ্যোগের অধীন ৩০০টি কারখানার শুধু ক্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এ ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা- জরিপ করা কারখানার মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ অংশীভবনে বা ভাড়া করা ভবনে অবস্থিত। এর প্রায় সবগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কারখানা। এসব কারখানা স্থানান্তরের জন্য সুবিধাজনক বাণিজ্যিক স্থানের সংকট রয়েছে। অন্যদিকে কারখানা সংস্কার ও স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানেরও অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'রেমিডিয়েশন ফিন্যান্স' প্রকল্পে কয়েকটি দাতা সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সহজ সুদে (শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ থেকে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ হারে) ঋণ দিলেও, প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কারখানার মালিকদের কাছে টাকা ছাড়ের ক্ষেত্রে সুদের হার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

পোশাক কারখানায় নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স ও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে গিয়ে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে বাড়তি খরচ সংকুলানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক

ব্র্যান্ড ও বায়ারদের পক্ষ থেকে ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির আশ্বাস পাওয়া যায়নি। বরং গত ১৫ বছরে আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের ক্রয়মূল্য প্রায় ৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন খরচ পিস প্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট দিলে কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতের বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব[৩]।

উল্লেখযোগ্য যেসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থবিরতা ও ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত সেগুলো হচ্ছে, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা কার্যকর না করা, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নীতিমালা বা গাইডলাইন প্রণয়ন না করা, রাজউকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ না করা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সেল গঠন না হওয়া, পোশাক কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নিনির্বাপক স্টেশন স্থাপন না করা, বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র এবং ব্যবহার সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক না করা, শ্রম পরিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম-বিষয়ক অভিযোগের জন্য কার্যকর হটলাইন স্থাপন না করা, দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ না করা ইত্যাদি।

উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও, শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হলেও, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বা শ্রমিকের চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালা শ্রমিকবান্ধব বা কল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও, শ্রমিকের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ট নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

[৩] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ মে, ২০১৩।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করছে :

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।
২. যেসব কারখানা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য নয় সেগুলোর টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩. শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. রানা প্লাজা ও তাজরীন দুর্ঘটনায় দায়ের করা বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডেটাবেইস গঠন করতে হবে।
৬. পোশাকশিল্পের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের কারখানার সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে এবং দ্রুত সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।
৭. শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. সব কারখানায় কলকারখানা অধিদপ্তরের হটলাইনের নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ দ্রুত কার্যকর করতে হবে।
১০. কারখানা সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণ সহজ সুদে কারখানার মালিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ তহবিলকে বিশেষ তহবিল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশে ক্রিকেট
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং পাতানো খেলা*

ইফতেখার জামান, রুমানা শারমিন ও মোহাম্মদ নূরে আলম[১]

ভদ্রলোকদের খেলা হিসেবে প্রবাদতুল্য ক্রিকেট[২] কেবল সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় ক্রিকেটের প্রচলন ঘটালেও, বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সহযোগী সদস্য বা ১৯৯৭ সালের আগে নিয়মিত সদস্যও হয়নি; শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশের মর্যাদা অর্জন করে। ক্রমেই ক্রিকেটের বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হয়[৩] এবং দেশে ও বিদেশে কোটি কোটি বাংলাদেশি নারী-পুরুষ, বিশেষ করে যুবা ও শিশু-কিশোরদের কল্পনার রাজ্য জয় করে নেয়। বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট কেবল একটি খেলাই নয়; এটা জাতীয় ঐক্যের প্রতীকও বটে[৪]। দেশের ভেতরে আগ্রহ বৃদ্ধির পাশাপাশি এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রবণতার সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশের ক্রিকেটও এখন একটি বিশাল অর্থ-উপার্জনকারী মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে[৫]; যার ফলে খেলাটিতে দুর্নীতির প্রবণতাও বৃদ্ধি

---

* ২০১৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

[১] এই কেস-স্টাডির জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাইমারি উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[২] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রিকেট খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধনী ইংরেজদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দী হতে এটা জনপ্রিয়তা পায়, যারা এতে ভদ্রলোকের মতো খেলার ওপর জোর দিতেন। ... উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যাটসম্যান জানতেন যে তিনি আউট হয়েছেন, তাহলে তিনি হাঁটা দিতেন, এমনকি আম্পায়ার ভিন্নমত পোষণ করলেও। সূত্র : The Times of India, 'Why is Cricket called a Gentleman's Game?', 17 April 2011, http://timesofindia.indiatimes.com/home/stoi/Why-is-cricket-called-a-gentlemans-game/articleshow/8003522.cms; and Quora.com, 'Why is cricket called a gentleman's game?', 18 November 2012, www.quora.com/Why-is-cricket-called-a-%E2%80%98gentleman%E2%80%99s-game%E2%80%99 (accessed 2 January 2015).

[৩] ২০১৪ সালের জুন মাসে বিসিবির সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল আইসিসির ১১তম সভাপতি নির্বাচিত হন, ২৬ জুন ২০১৪, www.cricbuzz.com/cricket-news/64129/mustafa-kamal-becomes-11th-icc-president (accessed on 20 January 2015). এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলেও একজন বাংলাদেশি প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করছেন।

[৪] সাবের হোসেন চৌধুরী, বিসিবির সাবেক সভাপতি, বিবিসি কর্তৃক উদ্ধৃত, ৯ মার্চ ২০১১।

[৫] অর্থের প্রভাব এত সর্বব্যাপী হয়ে পড়েছে যে খেলাটির ভদ্রোচিত ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটার এরাপল্লি প্রসন্ন যেমন বলেছেন, 'অর্থ এখন খেলাটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এটা আর এখন ভদ্রলোকের খেলা নয়'। http://sports.ndtv.com/cricket/news/208732-cricket-no-more-a-gentleman's-game-erapalli-prasanna (accessed 2 January 2015).

পেয়েছে। তাই খেলাটিকে আরও শক্তিশালী, মজবুত ও কার্যকর পরিচালনাকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

অন্যান্য ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের মতো সাম্প্রতিক সময় অবধি বাংলাদেশে টেস্ট ও এক দিনের ম্যাচ আকারে প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হতো। ২০১২ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্লাবদের একটি প্রতিযোগিতামূলক লিগ এবং ব্যবসায় উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রবর্তন ঘটে। তখন মুনাফা করা হয়ে পড়ে ক্রিকেটের একটি প্রধান বিষয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই স্বল্পমেয়াদি মুনাফার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে, সম্ভবত খেলাটির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বিসর্জনের বিনিময়ে। এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ২০১৩–১৪ সালের অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে প্রথম শ্রেণির বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের পরিবর্তে বিপিএলকে শ্রেয়তর সময় বরাদ্দ দেওয়া হয়[9]। অথচ জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট লিগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মান উন্নততর। এরপর মুনাফা অর্জন হয়ে পড়ে ক্লাবগুলোর মুখ্য বিবেচনা, যা থেকে জন্ম নেয় পাতানো খেলা ও স্পট ফিক্সিং[10]। এগুলো বাজি ধরার সঙ্গে সম্পর্কিত, যাতে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সহজেই সম্পৃক্ত করা যায়। খেলাটির পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাটতি সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এই সমীক্ষায় বিবেচ্য দুটি সমান্তরাল চ্যালেঞ্জ হলো: একদিকে বিসিবির সুশাসন নিশ্চিত করা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্রিকেটের স্বার্থে ও এর সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যে পাতানো খেলার মতো বহু-বিস্তৃত সমস্যার সমাধান করা। বিসিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটলে পাতানো খেলা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে।

---

[9] ESPN Cricinfo, 'Preference to BPL leads to clash in BCB', 6 August 2013.

[10] পাতানো খেলা ঘটে যখন একটি ম্যাচের পুরো ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়। যখন একটি খেলার সুনির্দিষ্ট ঘটনা আগেই নির্ধারণ করা হয় তখন স্পট ফিক্সিং হয়। স্পট ফিক্সিংয়ের তুলনায় পাতানো খেলাকে বেশি কঠিন মনে করা হয়। কারণ দল পাতানোর জন্য এতে অধিকসংখ্যক খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়।

ক্রিকেটে সুশাসন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের[11] সঙ্গে সংযুক্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশে ক্রিকেটের পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত[12]। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বিসিবির কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করে থাকে।

এর অর্থ আয়ের উৎসের মধ্যে আছে টিভি স্বত্ব, স্পনসরশিপ[13], অনুদান, বিশ্ব ক্রিকেট হতে আইসিসির আয়ের অংশ এবং আইসিসির ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রদত্ত ফি[14]। এ ছাড়া বিসিবি এনএসসির মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং নিজস্ব বিনিয়োগ হতে রাজস্ব পায়। বিসিবি তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়[15]। এতে আছেন ২৭ জন বোর্ড পরিচালক, একজন বোর্ড সভাপতি এবং ২০টি পরিচালনা কমিটি[16]।

বিসিবির করপোরেট কাঠামোর আইনি শ্রেণীকরণ সুনিশ্চিত নয়। এটা আইসিসির মতো কোনো করপোরেট সংস্থা বা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মতো কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা নয়,

---

[11] বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত; এ আইন পরবর্তী সময়ে ১৯৯১, ২০০৩ ও ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়। এটি একটি শীর্ষ সংগঠন যা ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। See www.nsc.gov/bd (accessed 11 March 2015). অন্যান্য ফেডারেশনের মতো এনএসসিতে বিসিবিরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে (ধারা ৪(ঞ), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে সংশোধিত)। www.nsc.gov.bd/rules/nscact/pdf (accessed 24 March 2015).

[12] See BCB's website, www.tigercricket.com.bd/bcb/aboutbcb (accessed 28 October 2014).

[13] বিসিবি ক্রিকেট স্পনসরশিপ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠী 'সাহারা গ্রুপ' ৯ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে চার বছরের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্পনসর হয়েছিল। এর আগে দুই বছরমেয়াদি একটি চুক্তির জন্য গ্রামীণফোন বিসিবিকে ১ দশমিক ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছিল, যা ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হয়। See http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKL4E8GU6Y820120530?irpc=932 (accessed 17 November 2014).

[14] ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর বিসিবির কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ); এ ছাড়া বিসিবির গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

[15] See BCB, 'Constitution: Amended in 2012' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2012), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/BCB-Constitution-2012.pdf (accessed 10 March 2015).

[16] কমিটিগুলো হলো : ক্রিকেট পরিচালনা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ, শৃঙ্খলা, খেলার উন্নয়ন, টুর্নামেন্ট, বয়স-গ্রুপভিত্তিক টুর্নামেন্ট, মাঠ, সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনা, আম্পায়ার, বিপণন ও বাণিজ্য, চিকিৎসা, দরপত্র ও ক্রয়, অর্থ, অডিট, নারী উইং, লজিস্টিক ও প্রটোকল, নিরাপত্তা, ঢাকা মহানগর ক্রিকেট, হাই-পারফরম্যান্স (নবগঠিত) এবং কারিগরি (নবগঠিত)।

অথবা ভারতের মতো 'নিবন্ধিত সোসাইটি'ও (দাতব্য সংস্থাগুলোর মতো) নয়[19]। বিসিবিকে দায়বদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই। এটা একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা হিসেবে গণ্য হয়। তবে বাস্তবে বিসিবি তার নিজের মতো করে কাজ করে থাকে; মন্ত্রণালয় ও এনএসসিবির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক বা দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে; সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিসিবির বিষয়ে কদাচিৎ তার তদারকি ভূমিকা পালন করে[20]।

এ চিত্র জাতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিষয়ক আইসিসির নির্দেশনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যাতে ক্রিকেট পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ ন্যূনতম পর্যায়ে এবং জাতীয় ক্রিকেট সমিতিগুলোর স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে[21]। বিসিবির সাবেক কর্মকর্তারা অবশ্য বলেছেন যে বিসিবিতে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে, বিশেষত নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং সভাপতি ও সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে[22]। বিসিবির পরিচালকরা ২০১২ সালের ১ মার্চে বিসিবির সংবিধান সংশোধন করেছিলেন; এরপর বোর্ডের পরিচালক নির্বাচনের জন্য বিসিবির ভেতর প্রথমবারের মতো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বর্তমান সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও সভাপতি ও পরিচালক পদে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক স্বার্থ এখনো প্রভাব ফেলে[23]।

যদিও বিসিবির গঠনতন্ত্র সমগ্র দেশ হতে প্রতিনিধিত্বের কথা বলে, অধিকাংশ বোর্ড সদস্য ঢাকাভিত্তিক ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন, যাদের সঙ্গে শাসক দলের সংযোগ রয়েছে। এমন অভিযোগও আছে যে বর্তমান নেতৃত্বের স্বার্থে বোর্ডের পরিচালকরা একতরফাভাবে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছেন[24]। সভাপতি সাধারণ পরিষদের ৫ জন কাউন্সিলর মনোনীত করেন[25]; এবং পরিচালনা কমিটিগুলোর সদস্য নির্বাচন করেন; এর ফলে বিসিবির কার্যক্রম সভাপতি ও তাঁর

---

[19] BCB, Before the Chairman, the Disciplinary Panel' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/appeal/decision.pdf (accessed on 19 March 2015), p. 41.

[20] ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর বিসিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর বিসিবির সাবেক পরিচালকদের সঙ্গে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গৃহীত সাক্ষাৎকার (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[21] আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সংশোধিত ও পুনর্গঠিত মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ২.৯ নম্বর ধারা।

[22] বিসিবির সাবেক পরিচালকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪।

[23] বর্তমান সভাপতি ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্যও। সাবেক সভাপতিদের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। See: BCB, 'List of Presidents', www.tigercricket.com.bd/bcb/former-president (accessed 25 March 2015).

[24] বিসিবির সাবেক পরিচালকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪ এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র।

[25] বিসিবি (২০১২), 'গঠনতন্ত্র', ধারা ৯.৩ (৯.৩.৮), পৃ. ৭।

এবং পরিচালনা কমিটিগুলোর সদস্য নির্বাচন করেন; এর ফলে বিসিবির কার্যক্রম সভাপতি ও তার পছন্দের কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে পড়ে। অভিযোগ আছে যে ম্যাচের ভেন্যু নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে[৩৮]। অধিকন্তু, সাংঘর্ষিক স্বার্থের অভিযোগও আছে, উদাহরণস্বরূপ একজন পরিচালকের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি বিপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন[৩৯]। ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে পরিকল্পনার অভাব এবং আচরণ পরিবর্তন ও নৈতিকতাবিষয়ক কর্মসূচির অনুপস্থিতির কারণেও বিসিবির সমালোচনা করা হয়[৪০]।

ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই[৪১]। ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে সাধারণভাবে অসদাচরণ ও দুর্নীতির কথা বলা আছে, কিন্তু ক্রিকেটে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। বিশ্ব ক্রিকেটে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য আইসিসির রয়েছে নিজস্ব দুর্নীতিবিরোধী কোড; এ ছাড়া আইসিসি একটি দুর্নীতিবিরোধী নিরাপত্তা ইউনিটও (আকসু) প্রতিষ্ঠা করেছে; এ দুটোরই উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শৃঙ্খলা ও সততা নিশ্চিত করা। বিসিবি তার নিজস্ব কোড চালু করেছিল ২০১২ সালের ১ অক্টোবর, যা আইসিসির কোডের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সংশোধন করা হয়। বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডে দুই-স্তরে আপিল প্রক্রিয়ার বিধান আছে[৪২]। যদি কোডের ৫.১.১ ধারার আওতায় কোনো খেলোয়াড় বা সহায়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের হয়, তাহলে বিসিবি একজন সভাপতির নেতৃত্বে একটি সাময়িক শৃঙ্খলা প্যানেল (ডিপি) গঠন করবে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই এবং অভিযোগের সঙ্গে অতীত সম্পৃক্ততা নেই এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি

---

[৩৮] উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশ্বমানের ভেন্যু (বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম) থাকা সত্ত্বেও একটি কমিটি বগুড়াকে ভেন্যু হিসেবে নির্বাচন করেনি। একইভাবে আরেকটি কমিটি সিলেটকে নির্বাচন করেনি, যদিও সেখানে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ছিল; উক্ত ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আমলে স্টেডিয়াম নির্মাণ হওয়াটা বিবেচ্য বিষয় ছিল। সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বিসিবির সাবেক পরিচালকদের সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪।

[৩৯] ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবস্থাটি (একটি দলের স্বত্ব ও ব্র্যান্ড লিজ দেওয়া) বাংলাদেশে আদিতে তিন বছর মেয়াদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। এর সাফল্যের কারণে এটা এখন অভ্যন্তরীণ ক্রিকেটের একটি স্থায়ী অংশ হয়ে পড়েছে।

[৪০] মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বর্তমান জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সাক্ষাৎকার, ২৩ অক্টোবর ২০১৪; জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং বিসিবি পরিচালনা কমিটির বর্তমান সদস্যের সাক্ষাৎকার, ২৮ অক্টোবর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[৪১] BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detfinal.pdf (accessed 19 March 2015), p. 16.

[৪২] ESPN Cricinfo, 'ICC, BCB to appeal BPL anti-corruption tribunal' verdict', 18 July 2014, www.espncricinfo.com/bangladesh/content/story/761553.html (accessed on 5 November 2014).

দুর্নীতিবিরোধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন[৭৬]। ট্রাইব্যুনাল মামলাটি শুনবে এবং একটি রায় দেবে; ইচ্ছা করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। যদি এতেও অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্তরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (সিএএস) আপিল করা যাবে[৭৭]।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রবর্তন

এমন প্রেক্ষাপটে বিপিএলের প্রবর্তন হয়, যা ছিল কিছুটা সমস্যাপূর্ণ। এটা করা হয়েছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে, যেখানে টুর্নামেন্টের জন্য উপযুক্ত নীতি বা বিধি ছিল না। যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত মাপকাঠি ছাড়াই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ করেছিল। উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড বা বিদেশি মুদ্রায় সম্মানী পরিশোধের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা বাংলাদেশ ব্যাংকের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কাছ থেকে বিসিবি ও ফ্র্যাঞ্চাইজিরা অনুমতি নিতেও ব্যর্থ হয়; এর ফলে কিছু খেলোয়াড়ের 'স্বাক্ষর-সম্মানী' পরিশোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি[৭৮]। এই বিচ্যুতি এবং খেলোয়াড়দের সাধারণভাবে নগদ অর্থ প্রদান করায় কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল[৭৯]। এ ছাড়া ক্রয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগও আনা হয়েছে[৮০]।

---

[৭৬] বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডের ৫.১.২ ধারা অনুযায়ী, 'দুর্নীতিবিরোধী ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য, যিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজের নিচে নন, ট্রাইব্যুনালের আহ্বায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ক্রিকেট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন সদস্য নেওয়া হবে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত নাগরিকদের মধ্য থেকে অন্যজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

[৭৭] সিএএস একটি আধা-বিচারিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা ক্রীড়াসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লুসানে স্থাপন করা হয়েছে; আদালতগুলো স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্ক, সিডনি ও লুসানে।

[৭৮] উদাহরণস্বরূপ, রাজস্ব বোর্ড বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন না নেওয়ার ফলে বেশ কয়েকজন বিদেশি খেলোয়াড়ের চুক্তি-ফি পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। নিশ্চয়তাদাতা হিসেবে এসব ফি পরিশোধের চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায় বিসিবির ওপর, যা তারা ক্রমান্বয়ে করে আসছে। এই ফি-পরিশোধ-সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক কোনো দলিল বিসিবি কখনোই সংগ্রহ করেনি। এ-সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য বিসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুকূলে অব্যাহতভাবে সময় বাড়িয়েছে, যা এখনো অমীমাংসিত। মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তারা, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪; The Daily Star (Bangladesh), 'BCB chasing its own tail', 2 November 2012, http://archive.thedailystar.net/newDesign/print_news.php?nid=255855 (accessed 17 November 2014).

[৭৯] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তারা, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪।

[৮০] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তারা, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪; ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার; ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বিসিবির সাবেক পরিচালকদের সাক্ষাৎকার।

পাতানো খেলা : অর্থই অনিষ্টের মূল

সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাধুলার বিরাট প্রভাব রয়েছে, কারণ এটা বিশেষত কিশোর-তরুণদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ বা রোল মডেল তৈরি করে[৮৮]। বাংলাদেশে বিশেষত তরুণদের মধ্যে ক্রিকেটের বিপুল জনপ্রিয়তা আছে, যেখানে জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশের বয়সই ২৫ বছরের নিচে[৮৯]।

অর্থের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় ক্রিকেটে খেলা পাতানো এবং স্পটফিক্সিংসহ ঘুষ লেনদেন ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। এতে করে এ খেলায় সততার অবনমন বিষয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ভার্সন, বিশেষ করে বিপিএলের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটকে ক্রিকেট খেলোয়াড়, দল, সংগঠন ও অন্যান্য অংশীদারের জন্য দ্রুত অর্থলাভ করার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়[৯০]। খেলা পাতানোয় জড়িত ব্যক্তিরা এই ব্যবসায়ী উদ্যোগের কোনো একদিকে জড়িত থাকার ভান করে এতে অনুপ্রবেশ করেন; একই সময়ে তারা বিভিন্ন দল, খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এসব সম্পর্ক একসময় যোগসাজশ এবং বিশেষ করে তরুণ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এমনকি বাধ্যকরণে পর্যবসিত হয়, যাদের অনেকেই সাধারণ পরিবার থেকে আসেন এবং দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকিতে অবস্থান করেন[৯১]।

খেলোয়াড়দের কথা বলতে গেলে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি ২০০১ সালে ১৭ বছর বয়সে সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন; তিনি বিভিন্ন ম্যাচ ও প্রতিযোগিতায় স্পটফিক্সিংয়ের বিনিময়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। আশরাফুল শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একটি টেস্ট ম্যাচে স্পটফিক্সিংয়ে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি একজন বাজিকরের কাছ থেকে ৭ লাখ টাকা (প্রায় ১০ হাজার মার্কিন ডলার) নিয়েছিলেন, যদিও দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ায় সে যাত্রায় তিনি কথা রাখতে

---

৮৮ TI, 'ICC Governance Review: Submission on behalf of Transparency International' (London: Transparency International, 2011).

৮৯ US Department of Commerce, 'Population Trends: Bangladesh', PPT92-4 (Washington DC: Department of Commerce, 1993), www.census.gov/population/international/files/ppt/Bangladesh93.pdf.

৯০ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তা, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ নভেম্বর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

৯১ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তা, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪; জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং বিসিবি অপারেশনস কমিটির বর্তমান সদস্য, ২৮ অক্টোবর ২০১৪; এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান খেলোয়াড়, ২৩ অক্টোবর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

পারেননি[৫৮]। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এই প্রতিশ্রুতি পরে ২০১২ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে স্থানান্তর করা হয়েছিল[৫৯]; তা ছাড়া ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের আরেকটি ম্যাচে স্পটফিক্সিংয়ের বিনিময়ে আরও ১০ হাজার মার্কিন ডলার আয় করার কথাও আশরাফুল স্বীকার করেছিলেন[৬০]। এ ছাড়া ২৫ লাখ টাকার (প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার) বিনিময়ে ২০১২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আরেকটি ম্যাচেও স্পটফিক্সিংয়ে তার ভূমিকা রাখার কথা শোনা যায়[৬১]। বিপিএলের দ্বিতীয় আসরে স্পটফিক্সিংয়ের জন্য বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী প্যানেল আশরাফুলকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ লাখ টাকা (প্রায় ১৩ হাজার মার্কিন ডলার) জরিমানা এবং ক্রিকেট থেকে আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল; আপিলের পর এটাকে পরে পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং আইসিসির কাছ থেকে 'ভালো আচরণ'-এর সনদ পাওয়া সাপেক্ষে এ সাজা আরও দুই বছর কমানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল[৬২]।

খেলা পাতানোয় আম্পায়াররাও জড়িত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নাদির শাহর উদাহরণ টানা যায়, যাকে ২০১৩ সালের মার্চে বিসিবি ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অর্থের বিনিময়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিছু খেলোয়াড়ের অনুকূলে সিদ্ধান্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন, যা ইন্ডিয়া টিভির গুপ্ত সম্প্রচারের (স্টিং ব্রডকাস্ট) মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল[৬৩]। খেলায় দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করতে বাজিকরদেরও তৎপর থাকতে দেখা গেছে। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খেলোয়াড়দের এলাকায় অবৈধভাবে প্রবেশ করার সময় সাজিদ খান নামের এক পাকিস্তানিকে আটক করা হয়েছিল; চিটাগং কিংস এবং বরিশাল বার্নার্সের মধ্যকার বিপিএল ম্যাচ পাতানোর চেষ্টা করার সন্দেহে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল[৬৪]। ২০১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার

---

[৫৮] BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013: Determination' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detreason/pdf; প্রথম আলো (বাংলাদেশ), ৩১ মে ২০১৩।

[৫৯] প্রথম আলো (বাংলাদেশ), ৩১ মে ২০১৩।

[৬০] Ibid.

[৬১] Ibid.

[৬২] ট্রাইব্যুনাল তার দোষ স্বীকারকে বিবেচনায় নিয়েছিল, বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী আচরণবিধির ৬.৪, ৬.৩.৩, ৬.১.২.১, ৬.১.২.২, ৬.১.২.৩, ৬.১.২.৭ এবং ৬.১.২.৮ ধারা অনুযায়ী। BCB (2014), 'Determinations'; The Daily Star (Bangladesh), 'Ashraful's ban now for 5 yrs', 30 September 2014, www.thedailystar.net/ashrafuls-ban-now-for-5-yrs-43961 (accessed 20 November 2014); BCB (2014), 'Before the Chairman'.

[৬৩] ESPN Cricinfo, 'BCB allows Nadir Shah to officiate in match', 28 September 2014, www.espncricinfo.com/bangladesh/content/story/785529.html.

[৬৪] ESPN Cricinfo, 'Cloud over BPL after fixing arrest', 27 February 2012, www.espncricinfo.com/bangladesh-premier-league-2012/content/story/555380.html (accessed 18 November 2014).

সময় ভারতের নাগরিক অতনু দত্তকে[৪৪] এপ্রিল মাসে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবৈধ বাজি ধরায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছিল[৪৫]। তাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার ও পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; পরবর্তী সময়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি[৪৬]।

বিপিএল নিজেও দুর্নীতির এই হুমকি থেকে মুক্ত থাকেনি। তাদের হেড কোচ ইয়ান পন্টের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর আকসু ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল[৪৭]। পন্টের দাবি ছিল, দলটির মালিক শিহাব চৌধুরী ২০১৩ সালের নভেম্বরে চিটাগং কিংসের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের কয়েকটি বিষয় পাতানোর মাধ্যমে তাকে পরাজিত হতে বলেছিলেন[৪৮]। এই দাবির বিষয়ে আকসু বিসিবি বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে জানায়নি, যদিও ইতিপূর্বে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডের তদারকি, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য আকসু বিসিবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল[৪৯]। আকসু ম্যাচটি বাতিলের জন্য তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেনি এবং পাতানো খেলার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তা মাঠে গড়াতে দিয়েছিল।

---

[৪৪] ৪০-বছর বয়স্ক ব্যক্তি এর আগে বিশ্ব টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট চলাকালে ২০১৪ সালের ৩ এপ্রিলে বেনাপোল স্থলবন্দরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিন দিন পর তাকে আবারও ঢাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গ্রেপ্তার করে।

[৪৫] Bdnews24.com, 'Indian bookie arrested for third time', 13 April 2014, http://bdnews24.com/bangladesh/2014/04/13/indian-bookie-arrested-for-third-time (accessed 18 November 2014).

[৪৬] New Age, 'Arrested Indian 'bookie' released on bail', 11 April 2014, http://newagebd.net/1831/arrested-indian-bookie-released-on-bail/#sthash.i4bskmir.LMM7KrPK.dpbs (accessed 4 May 2015).

[৪৭] ইয়ান ফেলিং পন্ট ছিলেন একজন সাবেক ইংরেজ খেলোয়াড়, যিনি মূলত অ্যাসেক্সের হয়ে খেলতেন। বিপিএলের দ্বিতীয় আসরে তিনি ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস ফ্র্যাঞ্চাইজির হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেন এবং খেলা পাতানোর ষড়যন্ত্রের বিষয়ে প্রথম আকসুকে অবহিত করেন : The Daily Star (Bangladesh), 'Reason judgement on BPL corruption', 11 June 2014, www.thedailystar.net/sports/reason-judgement-on-bpl-corruption-28052 (accessed 17 November 2014).

[৪৮] ২০১৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাতে পাতানো খেলা ও স্পটফিক্সিংয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল এবং পরের দিন পন্ট আকসুর দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থাপক পিটার ওকিফকে এ বিষয়ে জানিয়েছিলেন : প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকেও পরিষ্কার ছিল যে ম্যাচ শুরুর আগেই ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস কীভাবে ম্যাচটি হারবে, কারা কারা জড়িত থাকবেন এবং স্পটফিক্সিং কী করে সংঘটিত হবে তার বিস্তারিত আকসু জানত। বিসিবি (২০১৪), 'কেস নং ১/২০১৩'।

[৪৯] BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013: Determination: Conclusions and Orders' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detconclusion.pdf (accessed 19 March 2015); মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, সাংবাদিক, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৫ নভেম্বর ২০১৪।

আকসুর কাছ থেকে নোটিশ পাওয়ার পর বিসিবি একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল, যাতে তিনজন বিদেশিসহ ৯ জন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল[৪২]। ট্রাইব্যুনাল শিহাব চৌধুরীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ও ২০ লাখ টাকা (প্রায় ২৫ হাজার মার্কিন ডলার) জরিমানা করেছিলেন[৪৩]। তবে আপিলের পর ওই জরিমানা প্রত্যাহার করা হয়। প্রমাণের অভাবে ট্রাইব্যুনাল অন্য ছয়জনকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, যদিও এদের মধ্যে দুজন দোষ স্বীকার করেছিলেন[৪৪]। পরবর্তী সময়ে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের অপর মালিক এবং শিহাব চৌধুরীর বাবা সেলিম চৌধুরীর অব্যাহতির বিরুদ্ধে বিসিবি ও আকসু আপিল করেছিল; তিনিও পরে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায়

একজন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণে প্রেরণ করার মতো পদক্ষেপ নিয়ে বিসিবি সম্প্রতি তার দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়েছে। আকসুর সহায়তায় বিসিবি এখন যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা সিরিজের আগে দুর্নীতিবিরোধী পরিচিতিমূলক সভার আয়োজন করে[৪৫]। এগুলোর উপযোগিতা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের জন্য কিছু মৌলিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োজনীয় মানবিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের স্বাধীনতা, পেশাদারত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দ্রুত এবং দক্ষ অনুসন্ধান ও বিচারিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এটা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জন করে। বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোড অনুসৃত হচ্ছে কি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিবীক্ষণের ক্ষমতা বিসিবির থাকতে হবে। খেলা পাতানো, স্পটফিক্সিং এবং প্রতারণার অন্যান্য কৌশলকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য আইনি বিধান সংযোজন করতে হবে।

আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্রিকেটের জন্য একটি স্বাধীন ও স্থায়ী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করতে হবে, খেলায় দুর্নীতি ও অনিয়মসংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধান ও মামলা পরিচালনার ক্ষমতা যার থাকতে হবে। কোড লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা একদিকে যেমন বিসিবির আওতায় থাকা প্রয়োজন, তেমনি খেলোয়াড়, কোচ, আম্পায়ার, ক্লাব, ফ্র্যাঞ্চাইজি, বিসিবি বোর্ড, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকসহ যাবতীয় অংশীজনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা ন্যায়পালের থাকতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সম্পর্কিত ব্যবসায়িক বিষয়াদি সম্পর্কে

---

[৪২] শিহাব জিশান চৌধুরী (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের মালিক), সেলিম চৌধুরী (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের মালিক), গৌরব রাওয়াত (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের কর্মকর্তা), মোহাম্মদ রফিক (খেলোয়াড়), মোশাররফ হোসেন রুবেল (খেলোয়াড়), মাহবুবুল আলম রবিন (খেলোয়াড়), ড্যারেন স্টিভেন্স (খেলোয়াড়), কৌশল লোকুয়ারচ্চি (খেলোয়াড়) এবং মোহাম্মদ আশরাফুল (খেলোয়াড়) : বিসিবি (২০১৪) : 'কেস নং ১/২০১৩'।

[৪৩] BCB (2014), 'Determination'.

[৪৪] The Daily Star (11 June 2014).

[৪৫] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তা, ১৯ অক্টোবর ২০১৪; অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র।

অভিযোগ গ্রহণ এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ন্যায়পালের কার্যালয়ের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়াদির মধ্যে আছে মিডিয়াস্বত্ব ও স্পনসরশিপ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র, যেগুলোর সঙ্গে ক্রিকেটের সততা ও সুনাম জড়িত। নিজ কার্যালয়ে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন থেকে ক্রিকেট খেলার কাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সামর্থ্য ন্যায়পালের থাকতে হবে।

বিসিবির পরিচালনা উন্নততর করতে হলে একে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তদারকির অধীন আনতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের[88] সঙ্গে সংগতি রেখে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে (এসিইউ) সম্প্রসারণ করে শুদ্ধাচার ও দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটে পরিণত করতে হবে; এর লক্ষ্য হবে অধিকতর সততা, নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষাসহ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

ক্রিকেট খেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সব পক্ষ, বিশেষত ফ্র্যাঞ্চাইজি, ব্যবস্থাপক, কোচ, অধিনায়ক, দেশি বা বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী কোডকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করা এবং এর মাধ্যমে অবৈধ আচরণ প্রতিরোধ করা। বিসিবির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিসহ এসব ব্যক্তি এবং তাদের নিকটতম পরিবার, এজেন্ট ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারীসহ (গেট কিপার) সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয় ও সম্পদবিবরণী প্রকাশের আওতায় আনতে হবে। যদি বৈধ আয়ের সঙ্গে আয় ও সম্পদের পরিমাণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তরুণ ক্রিকেটারদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। এর মাধ্যমে ক্রিকেটে সুশাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী অবকাঠামোর চাহিদা ও সরবরাহের দুটি দিককেই শক্তিশালী করতে হবে[89]।

---

[88] The National Integrity Strategy is a comprehensive set of goals, strategies and action plans aimed at increasing the level of independence to perform, accountability, efficiency, transparency and effectiveness of state and non-state institutions in a sustained manner over a period of time: Chancery Law Chronicles (Bangladesh), 'Framework of National Integrity Strategy: An Inclusive Approach to Fight Corruption' (Dhaka: Government of Bangladesh, 2008), www.clcbd.org/document/download/143.html (accessed 8 March 2015)

[89] এ ধরনের উদ্যোগের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৩-এর আগে টিআই-বাংলাদেশের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা 'দুর্নীতিকে না বলুন' স্লোগানে অঙ্গীকার করেছিলেন, এর মাধ্যমে তারা দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার বিষয়ে জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। Transparency International Bangladesh, 'Bangladesh National Cricket Team Says No to Corruption', 8 December 2013, www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4460-bangladesh-national-cricket-team-says-no-to-corruption. এ ধরনের প্রচেষ্টাকে আরও উন্নত ধাপে নেওয়া ও টেকসই করা এবং বিসিবিসহ অন্যান্য অংশীজনকে এতে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই।

গবেষক পরিচিতি

মো. মোস্তফা কামাল

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত ও ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে জড়িত।

রুমানা শারমিন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি শিক্ষা খাত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকমিশন নিয়ে গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়নাধীন এ টু আই প্রকল্পে কর্মরত।

মোহাম্মদ নূরে আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততা ব্যবস্থা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজবিজ্ঞান' বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

নিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততা ব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততা ব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। অধ্যাপক আমিনুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, নরওয়ের বারগেন ইউনিভার্সিটি, ফিনল্যান্ডের টেম্পেরে ইউনিভার্সিটি, তানজানিয়ার দার-এস-সালাম ইউনিভার্সিটি এবং থাইল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিজিটিং অধ্যাপক। তার গবেষণাকর্মের মধ্যে রয়েছে পাবলিক পলিসি, তুলনামূলক সুশাসন, স্থানীয় শাসন ও রাজনীতি, গবেষণাপদ্ধতি এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

ইফতেখার জামান

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে এ পদে যোগদানের আগে তিনি বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক (১৯৯৯–২০০৪), শ্রীলঙ্কার কলম্বোস্থ রিজিওনাল সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক (১৯৯৫–৯৯) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ও পরিচালক (১৯৮১–৯৫) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও একাডেমি অব ইকোনমিকস প্রাকসোয়াও এবং ওয়ারশো থেকে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. জামান বাংলাদেশের উন্নয়ন, সমাজ পরিবর্তন, রাজনীতি, সুশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত আছেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বেসরকারি খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ছয়টি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় এই সপ্তম সংকলন প্রকাশিত হলো।

978-984-3421-4